ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 276-281
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.459

কলকাতার থিয়েটার-চর্চায় প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিকতা: প্রেক্ষিত ঋত্বিক ঘটকের নাটক 'জ্বালা'

নাসিমা রহমান, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.04.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The legendary Bengali filmmaker Ritwik Kumar Ghatak was not merely a timeless cinematic artist; he was also a dedicated proponent of the broad-based People's Theatre Movement and a playwright of considerable stature. The central objective of this essay is to re-evaluate *Jwala*—a play written by Ritwik Ghatak in 1950—and to examine its relevance within the context of contemporary theatre practice in Kolkata. As a playwright, Ritwik Ghatak transcended the conventions of traditional realism to create a distinct atmosphere characterized by an 'epic' theatrical style. The characters in *Jwala* are not merely isolated individuals; rather, they serve as embodiments of a collective socio-economic reality. This essay explores this formalistic innovation and assesses its continued significance on the modern stage. The narrative of *Jwala* revolves around the post-Partition refugee crisis in Kolkata, the issue of unemployment, and the moral decay afflicting the middle-class society of the era. As this essay demonstrates, Ritwik Ghatak possessed the remarkable ability to channel the pervasive turbulence of his times through the vessel of individual human suffering. The play's central thematic motif lies in depicting the moral rot of a living society through the voices and narratives of its 'dead souls.' This essay presents a theoretical argument explaining why Ritwik Ghatak's plays—and *Jwala* in particular—deserve to be revisited repeatedly within the contemporary landscape of Kolkata's theatre scene. The primary contention here is that theatre should not function merely as a form of entertainment, but rather as a potent instrument of political engagement. Ultimately, this essay concludes that within the context of the current capitalist social order—characterized by human alienation and a profound sense of disconnection—the internal struggles and existential anguish depicted in *Jwala* remain as relevant and resonant today as they were in the past.

Keywords: Ritwik Ghatak, Power, Kolkata Theatre, People's Theatre Movement, Partition, Realism

থিয়েটার আর্ট প্রসঙ্গে কলকাতা সবসময় একটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। এখানে যাপনকেন্দ্রিক সুবিধে বেশি হওয়ায় এখানে চর্চা করা যেকোনও বিষয়েই সুবিধেজনক হয়ে থাকে। থিয়েটার চর্চার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং একটা ধারা অব্যাহত রয়েছে যে কলকাতায় এসে থিয়েটার দেখাতে হবে। সেই ধারায় প্রচাররহিত থিয়েটারও থিয়েটারের বিশেষত্ব নিয়ে মৌলিক স্থানে রয়েছে। এর একটা বড় কারণ একই জায়গায় প্রায় সব ধরনের থিয়েটারের সূচনা এবং ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে যাওয়া। ইতিহাস থেকে শিক্ষা, আর থিয়েটারে লোকশিক্ষা

এই দুইই এক সুতোর দুই ফুল। থিয়েটারের চর্চা প্রসঙ্গে আমরা এত বিস্তারিত বিষয়ে আলোচনা করতে পারি যে থিয়েটার শুধুমাত্র আর্ট প্রসঙ্গে আর আলোচনা করা না। এক প্রসঙ্গ টেনে আলোচনা শুরু হলেও আরও প্রসঙ্গ তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। এবং প্রসঙ্গ থিয়েটার ধরে, সেখান থেকে একটা থিয়েটারের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র ও মানব জীবন সারাংশ হিসেবে দেখাতেই এই প্রবন্ধ রচনা। থিয়েটার চর্চার কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। আর মানুষের সমস্যা নিয়েই থিয়েটারের সূচনা হয়। এও ইতিহাস থেকে জানা গেছে। তাই, থিয়েটার চর্চার কোনও প্রসঙ্গ উঠলেই, এর প্রাসঙ্গিকতা থাকে বলেই তা আলোচিত হবে। ধরা যাক এক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটকের একটা নাটক 'জ্বালা'। এই একটা নাটককে একক ধরে প্রসঙ্গ থেকে প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হবে।

সমগ্র চারের দশক জুড়ে মৃত্যুমিছিলের সাক্ষী থেকেছে গোটা কলকাতা। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা কী সুরাহা করতে পেরেছিল সমস্ত সমস্যার? হয়ত পারেনি বলেই বহু মানুষ বেছে নিয়েছিলেন আত্মহত্যার পথ। পি. সি. যোশির 'ইন্ডিয়ান ওয়ে' কাগজের বাংলার সংবাদদাতা ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। এই সময়ে পরপর একত্রিশটি আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে তিনি একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন— 'সুইসাইড ওয়েভ ইন ক্যালকাটা'। এই প্রতিবেদনের তথ্যের ভিত্তিতেই ছ'টি চরিত্রকে বেছে নিয়ে তৈরি হয়েছিল তাঁর নাটক 'জ্বালা'। ২৮ অক্টোবর ২০২৫ 'এইসময়' পত্রিকায় লেখা হচ্ছে–

> "'জ্বালা'-র বীজ ছিল সাংবাদিকতায়। ঋত্বিক তখন পি সি যোশির 'ইন্ডিয়ান ওয়ে' কাগজের বাংলার সংবাদদাতা। কলকাতায় তখন পরপর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। সেই ঘটনার প্রতিবেদন থেকেই 'জ্বালা' নাটকের জন্ম। ঋত্বিক লিখছেন, 'সে সময় আমি একত্রিশটা সুইসাইড দেখে 'সুইসাইড ওয়েভ ইন ক্যালকাটা' লিখে পাঠালাম। এই 'জ্বালা' নাটকে তার থেকে সিলেক্ট করা ছ'টা চরিত্র ইচ ওয়ান ইজ় এ ট্রু ক্যারেক্টার। 'জ্বালা' ইজ় এ ডকুমেন্টারি।"[১]

প্রশ্ন উঠতে পারে, এটি কী শুধুই মৃত মানুষের যন্ত্রণা? আশাবাদের চিহ্ন কোথায়? কিন্তু নাটকটিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব– 'জ্বালা' শুধু মৃত্যুর কথা বলে না, বলে এক সুন্দর দেশের কথা। যেখানে সব শান্তি, সব তৃপ্তি। কোথাও একটা আছে সেই দেশ। সেই দেশের পথ খুঁজতে হবে। খুঁজে পেতেই হবে সেই দেশটাকে। নাটকের খোকন চরিত্রের সংলাপে সেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যখন সে বলে– 'দাদু, তুমি যে একটা দ্যাশের কথা কইতা'। যার উত্তরে দাদু বলে– 'সে এক দেশ আছে, সুন্দর দেশ। তারই পথ খুঁজছি, সেখানে সব শান্তি সব রিক্ত। কোথাও একটা আছে।' মানুষের উপরের খোলসটাকে বাদ দিলে যে অবিরাম আর্তনাদের মধ্যে সে চুপ করে বসে থাকে, ঋত্বিকের নাটক তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় তাকে। নাটকের চরিত্ররা বাঁচতে চাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ক্রমাগত লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং হতাশার কারণে আত্মহননের মাধ্যমে মুক্তির পথ খোঁজে। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও আধুনিক কলকাতার শহুরে জীবনের মানসিক স্বাস্থ্যের সংকটের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এই নাটক। উচ্চ বেকারত্ব, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, এবং স্বপ্নের অপমৃত্যু— এই সবকিছুর ফলে সমাজে যে তীব্র মনস্তাত্ত্বিক 'জ্বালা' সৃষ্টি হয়েছে, তা মানুষের যুক্তিহীনতা বাড়িয়ে তুলছে। নাটকটির মূল বক্তব্য ছিল যে, অভাব-অনটনে মানুষ যুক্তিহীন হয়ে পড়ে। যখন অর্থনৈতিক চাপ অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন যুক্তির পরিবর্তে তাৎক্ষণিক ও আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্তের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই বিপন্নতা এবং ক্লান্তির চিত্রই নাটকটিকে আজও মর্মস্পর্শী করে তোলে।

ঋত্বিক কুমার ঘটকের শিল্পীজীবনের সূচনা হয় সাহিত্য এবং মঞ্চনাটকের মাধ্যমে। তাঁর শিল্পচিন্তার মূল ভিত্তি ছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং চরম মানবতাবাদ। মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, মানুষকে ভালোবাসা এবং তাদের যন্ত্রণার মধ্যে অনন্তকে প্রত্যক্ষ করাই ছিল এই শিল্পীর সারাজীবনের সাধনা। তিনি অকপটে বিশ্বাস করতেন যে, শিল্পকে কেবল সৌন্দর্যনিষ্ঠ হলেই চলে না; শিল্পকে অবশ্যই প্রথমে 'সত্যনিষ্ঠ' হতে হবে। এই

সত্য ছিল মূলত 'সামাজিক সত্য', যা মানুষের অভাব-অনটন এবং প্রয়োজনের উপর দাঁড়াতে বাধ্য। এই কঠোর আদর্শ থেকেই জন্ম নেয় তাঁর শিল্পের মৌলিক ভিত্তি— শ্রমিক, কৃষক, ছিন্নমূল মানুষ, এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের চিত্রায়ণ। এই পটভূমিতেই ১৯৫০ সালে রচিত হয় তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'জ্বালা'। এটি কেবল একটি নাট্যকর্ম ছিল না; এটি ছিল তাঁর ঘোষিত জীবনদর্শনের প্রথম বাস্তব প্রয়োগ। এই সত্যাশ্রয়ী শিল্পের আদর্শের কারণেই তিনি মূলধারার শিল্পের প্রতি তীব্র সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, মূলধারার বেশিরভাগ ছবি সামাজিক সত্যকে বর্জন করে মেক-আপ সজ্জিত কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে একটি 'স্বপ্নরাজ্য' তৈরি করে। এই শিল্পকর্মগুলি ক্লান্ত মধ্যবিত্তকে কঠিন বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে 'রূপকথা' হাতড়াতে সাহায্য করে। এই বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে, ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' নাটকটি কেবল সমসাময়িক দারিদ্র্যের কারণে করা আত্মহত্যার একটি দলিল ছিল না, বরং এটি ছিল তৎকালীন সমাজের মূলধারার শিল্পরীতির বিরুদ্ধে এক আদর্শগত বিদ্রোহ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, 'জ্বালা' নাটকটি তাঁর সামাজিক সত্যকে কেন্দ্র করে নির্মিত শিল্প-আদর্শের প্রথম প্রয়োগিক দলিল হিসেবে কাজ করে। এই নাটক কলকাতার পরবর্তী রাজনৈতিক থিয়েটারের আদর্শগত ভিত্তি স্থাপন করতেও সাহায্য করেছিল বলা যায়।

'জ্বালা' নাটকের আখ্যান অত্যন্ত সরল হলেও এর বিষয়বস্তু গভীর। নাটকটি রচিত হয়েছিল দেশভাগ-পরবর্তী কলকাতার চরম অস্থির সময়ে। নাটকের চরিত্ররা কেউ মধ্যবিত্ত বেকার, কেউ উদ্বাস্তু, কেউবা সমাজচ্যুত নারী। তারা সবাই শ্মশানে মিলিত হয়েছে আত্মহত্যা করার পর। ঋত্বিক এখানে কোনো কাল্পনিক গল্প বলেননি, বরং বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়ে মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে তুলে ধরেছিলেন। আজ ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে কলকাতার প্রেক্ষাপটে সেই 'উদ্বাস্তু' মানসিকতা বা অস্তিত্বের লড়াই শেষ হয়ে যায়নি, বরং তার রূপ বদলেছে। ১৯৫০ সালের প্রেক্ষাপটে রচিত এই নাটকটি মূলত মানবসমাজের দুটি চিরন্তন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার করুণ চিত্র তুলে ধরে— একদিকে অবস্থান করছে শোষকের দল এবং অন্য প্রান্তে রয়েছে শোষিত জনগোষ্ঠী। ঋত্বিক ঘটক এই শ্রেণী বৈষম্যকে অত্যন্ত বাস্তবধর্মী উপায়ে তাঁর একাঙ্ক নাটকে উপস্থাপন করেছেন। ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অভাব-অনটনের ক্রমাগত তাড়না শোষিত মানুষকে যুক্তিহীন করে তোলে, ফলে তারা যেকোনো চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। এই শোষিত মানুষরাই প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে চলেছে। কিন্তু যখন বাঁচতে চাওয়ার এই আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত অভাবের ধাক্কায় রুদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, তখন তারা লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকার পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে এলে হতাশা বাড়ে এবং কিছু চরিত্র আত্মহননের মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজতে ধাবিত হয়। নাটকটি ফর্মের দিক থেকে 'অ্যাবসার্ড' হলেও এর মর্মমূলে ছিল তীব্র প্রামাণ্য বাস্তবতা (Documentary Realism)। নাটকের চরিত্ররা সবাই মৃত; তারা প্রেতাত্মা হয়ে তাদের জীবনের সেই করুণ কাহিনীগুলো বর্ণনা করে যা তাদের বিষ পান করতে বা ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করেছিল। এই মৃত মানুষগুলো আসলে পচনশীল সমাজের বিরুদ্ধে এক নীরব কিন্তু শক্তিশালী সাক্ষ্য। আবারও দাদুর কথায় উঠে আসে যে তারাই সমাজকে মৃত্যুর পথ দেখিয়েছে। তাঁর সংলাপ– 'জ্বালা মেটানোর পথ নিজেদের শেষ করে দেওয়া, এইটিই তো বললাম আমরা পৃথিবীকে।...আমরা পথ দেখিয়েছি পথ শেষ হয়ে যাবার।' কিন্তু ঋত্বিক ঘটকের দর্শনে আত্মহনন কখনোই ব্যক্তিগত দুর্বলতা নয়, বরং তা ছিল কাঠামোগত সহিংসতার (Structural Violence) চূড়ান্ত রূপ। শোষক শ্রেণি যখন শোষিত মানুষের সমস্ত বাঁচার পথ রুদ্ধ করে দেয়, তখন আত্মহত্যাই হয়ে ওঠে তাদের শেষ প্রতিবাদ। তবে ঋত্বিক এখানে থেমে থাকেননি; তিনি নাটকের শেষ পৃষ্ঠাটি জনতার জন্য রেখে গিয়েছেন, যাতে তারা সংগ্রামের মাধ্যমে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। পিয়নের সংলাপে যেন ঋত্বিকের নিজের কথা– "বহু চিন্তা হয়েছে, পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে ধ্যান বহু হয়েছে; আসলে দরকার হচ্ছে পৃথিবীকে বদলানো।"[২] নাটকের মূল অনুসন্ধান এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়

যে– মানুষের জীবনে এই সঙ্কটের সৃষ্টি হয় কেন এবং কোন্ পথে মানুষের প্রকৃত মুক্তি আসে? এককথায় শোষণের অনিবার্য পরিণতি এবং মুক্তির প্রশ্ন হল নাটক 'জ্বালা'।

ঋত্বিক ঘটক তাঁর শিল্প-দর্শনে শ্রমিক, কৃষক, এবং ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণাকে কেন্দ্র করে কথা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, বাংলার ঘাটে-আঘাটায় কেবল মানুষ আর মানুষ, এবং তাদের বেঁচে থাকার দুঃখবোধ ও লড়াই আজও প্রায় একই। বস্তিবাসী, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, এবং নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন অভাব ও অনটনের 'জ্বালা' আজও তীব্র। আরও গভীর রাজনৈতিক দিক হলো, ঋত্বিক ঘটক সেই সমাজের সমালোচনা করেছিলেন যেখানে 'ধর্ম খেয়ে ফেলে খিদেকে'। আজকের রাজনৈতিক মেরুকরণের পরিস্থিতিতে, যেখানে মৌলিক অর্থনৈতিক চাহিদাগুলি প্রায়শই আবেগ বা পরিচয়ের সংকটের আড়ালে চাপা পড়ে যায়, সেখানে এই বাক্যটি এক কঠিন সামাজিক সত্য হিসেবে প্রতিফলিত হয়। ১৯৫০ সালে এই বৈষম্য দেশভাগ, মন্বন্তর এবং জমিদার-পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক কলকাতার প্রেক্ষাপটে এই শোষণ সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থিত। শোষক শ্রেণীর ক্রমাগত মুনাফা ও লোভ থেকে সৃষ্ট শ্রেণী বৈষম্য এখনও উপস্থিত সমাজে। বর্তমানে, এই শোষক শ্রেণী হলো কর্পোরেট পুঁজি এবং নয়া-উদারবাদী নীতি দ্বারা সৃষ্ট কাঠামোগত দুর্বলতা। ১৯৫০ সালের 'জ্বালা'র কারণ ছিল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিপর্যয়, আর ২০২৫ সালের 'জ্বালা'র কারণ হলো কর্পোরেট পুঁজি এবং নয়া উদারবাদী নীতির দ্বারা সৃষ্ট শ্রেণী বৈষম্য। নাটকের মূল চরিত্রগুলোর আত্মহত্যার পেছনে ছিল দারিদ্র্য আর কর্মহীনতা। একুশ শতকের কলকাতায় আজ 'গিগ ইকোনমি' বা অস্থায়ী চাকরির ভিড়ে যুবক-যুবতীদের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা, তা ঋত্বিকের সেই সময়ের বেকারত্বের হাহাকারের আধুনিক সংস্করণ। 'জ্বালা'-র সেই বেকার যুবকের হাহাকার আজও কলকাতার রাজপথে চাকরির দাবিতে বসা লড়াকু মুখগুলোর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়। নাটকটিতে দেখা যায়, সমাজের চাপে পিষ্ট হয়ে চরিত্রগুলো মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছে। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল যোগাযোগ বাড়লেও মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও ডিপ্রেশন বহুগুণ বেড়েছে। ঋত্বিক দেখিয়েছিলেন, সমাজ কীভাবে মানুষকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। আজকের দ্রুতগামী কর্পোরেট জীবনে মানসিক অবসাদ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে 'জ্বালা' নাটকটি এক গভীর সামাজিক সতর্কবার্তা হয়ে ওঠে। শোষক বনাম শোষিত চিত্রের নিরন্তরতা এবং তার মনস্তাত্ত্বিক পরিণতি অপরিবর্তিত থাকায় নাটকটির আবেদন হয়তো চিরকালীন।

National Crimes Record Bureau (NCRB)-এর হিসেব অনুযায়ী ২০২৩ সালে ভারতে আত্মহত্যা করেছেন ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৪১৮ জন। যা ২০২২ সালের তথ্যের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে একটি প্রতিবেদনে জানাচ্ছে India Mental Health Observatory (IMHO)। এটা নাকি বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ আত্মহত্যার রেকর্ড। এই সরকারি রিপোর্টের বাইরেও রয়েছে অসংখ্য আত্মহত্যা। সেই পরিসংখ্যান লক্ষ করলে দেখা যাবে অধিকাংশ মানুষই অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা, গরিব কৃষক, শ্রমিক, কর্মচ্যুত মানুষ ও কর্মহীন যুবক। এই পরিস্থিতিও পিয়নের সংলাপের মধ্যে বলে গেছিল ঋত্বিক বলে– 'পড়তে চেয়েছিলাম বলে করতে হল।' বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে আমরা এই আত্মহত্যার খবর পায়। অন্যদিকে Global Hunger Index (GHI) এর ২০২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী ১২৩টি দেশের মধ্যে ভারত ১০২ তম স্থানে রয়েছে, যার GHI স্কোর ২৫.৮, যা গুরুতর হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ। অপুষ্টির শিকার ১৭২ মিলিয়ন মানুষ যা ২০১৬ সালের তুলনায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ বেশি। তাই এই ২০২৬ সালে এসে ১৯৫০ সালে ঋত্বিক ঘটকের লেখা 'জ্বালা' নাটকটি কেবল একটি ঐতিহাসিক সৃষ্টি নয়, এটি সমাজ ও শিল্পের প্রতি এক বিপ্লবী আহ্বান। নাটকটির প্রাসঙ্গিকতা সময়-নিরপেক্ষ। মানুষের বেঁচে থাকার দুঃখবোধ এবং জীবনের লড়াই আজও প্রায় একই রয়ে গেছে। আর শোষক শ্রেণীর ক্রমাগত মুনাফার লোভ সমাজের শ্রেণী বৈষম্যকে ধরে রেখেছে। ১৯৫০ সালে নাটকের মাধ্যমে যে আগুন তিনি

জ্বালিয়েছিলেন, সেই 'জ্বালা' আজও বর্তমান কলকাতার সমাজের যন্ত্রণার সুনিপুণ প্রতিফলন। ঋত্বিক ঘটকের দর্শন ছিল মানুষের মধ্যে অনন্তকে প্রত্যক্ষ করা। সেই অনন্তের অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়ার জন্য, সমাজের উপেক্ষিত মানুষের 'জ্বালা'কে শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা আবশ্যক। কলকাতার থিয়েটারে ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' নাটকের প্রাসঙ্গিকতা একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন নয়, বরং এটি একটি সমকালীন আদর্শগত চ্যালেঞ্জ।

কার্ল মার্কস তাঁর 'Alienation' বা বিচ্ছিন্নতাবাদ তত্ত্বে দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ তার উৎপাদিত পণ্য, প্রকৃতি এবং শেষ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 'জ্বালা' নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে আমরা যে অস্থিরতা ও খণ্ডবিখণ্ড অস্তিত্বের ছবি দেখি, তা আজকের কর্পোরেট সংস্কৃতির সমান্তরাল। আজ মানুষ কেবল একটি 'রিসোর্স' বা সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগত মেধা ও আবেগ যখন বাজারের চাহিদার কাছে নতি স্বীকার করে, তখন জন্ম নেয় এক গভীর শূন্যতাবোধ— যা ঋত্বিকের নাটকে 'জ্বালা' হয়ে ফুটে উঠেছিল। পুঁজিবাদ টিকে থাকে নিরন্তর ভোগের ওপর ভিত্তি করে। এই ব্যবস্থায় টিকে থাকার লড়াইটা এখন কেবল অন্ন-বস্ত্রের নয়, বরং সামাজিক মর্যাদার লড়াইয়ে রূপ নিয়েছে। 'জ্বালা'-র চরিত্রগুলো যেমন এক চিলতে আশ্রয়ের জন্য বা একটু সামাজিক স্বীকৃতির জন্য হাহাকার করত, আজকের মধ্যবিত্ত সমাজও ঠিক তেমনি ইঁদুর দৌড়ে শামিল। কর্মসংস্থানের অভাব এবং ছাঁটাইয়ের আতঙ্ক মানুষকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে। প্রযুক্তির চরম উন্নতির যুগেও মানুষ আজ ভীষণ একা। সোশ্যাল মিডিয়ার ভিড়েও মনের গহীনে সেই পুরনো 'জ্বালা' রয়ে গেছে। ঋত্বিক ঘটক যখন 'জ্বালা' লিখেছিলেন, তখন প্রেক্ষাপট ছিল দেশভাগ এবং তজ্জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা। আজ ভৌগোলিক দেশভাগ না থাকলেও মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বিভাজন। পুঁজিবাদ যত উন্নত হচ্ছে, মানুষের ভেতরের শূন্যতাও তত বাড়ছে। 'জ্বালা' নাটকের সেই যন্ত্রণা আজ কেবল মঞ্চের সংলাপ নয়, বরং প্রতিটি সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতা। যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে শোষণের কাঠামো বজায় থাকবে এবং মানুষ তার মানবিক সত্তার চেয়ে তার অর্থনৈতিক উপযোগিতা দিয়ে বিচার্য হবে, ততক্ষণ 'জ্বালা'-র সেই অন্তলীন হাহাকার আমাদের সমাজব্যবস্থায় সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থেকে যাবে। আজকের এই জটিল সময়ে দাঁড়িয়ে ঋত্বিকের সেই আর্তনাদ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, উন্নয়নের চকমকে আবরণের নিচে আজও এক গভীর ক্ষত লুকিয়ে আছে।

ঋত্বিক ঘটকের শিল্পদর্শন এবং 'জ্বালা' নাটক কলকাতার থিয়েটারকে তার ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঋত্বিক স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, বেশিরভাগ মূলধারার শিল্প সামাজিক সত্যকে বর্জন করে 'স্বপ্নরাজ্য' তৈরি করে। কলকাতার থিয়েটার যখন প্রায়শই বিনোদন, বা কেবল আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায়, তখন 'জ্বালা' নাটকটি তাকে সামাজিক সত্যের সম্মুখীন হতে চ্যালেঞ্জ জানায়। এই নাটক মঞ্চায়ন করা শুধু একটি শিল্পকর্ম প্রদর্শন নয়, এটি একটি আদর্শগত বিবৃতি, যা সামাজিক পরিবর্তনে থিয়েটারের ভূমিকা পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানায়। ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' কোনো কালখন্ডে আটকে থাকা নাটক নয়। আধুনিক কলকাতার থিয়েটারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এই নাটকটি এক নতুন দিকচিহ্ন হতে পারে, যা দর্শককে কেবল সমাজ সচেতনই করে না, বরং মানুষের ভেতরের অন্তর্নিহিত 'জ্বালা' বা অস্থিরতাকে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। এটি থিয়েটারকে ঋত্বিকের মানবিক দর্শন মেনে সাধারণ মানুষের জ্বালাকে উপেক্ষা না করে, শিল্পের সামাজিক অঙ্গীকার পূরণে বাধ্য করবে। নাটকটি আজও কলকাতার থিয়েটারকে প্রশ্ন করে- তারা কি ঋত্বিকীয় সামাজিক সত্যের পথ অনুসরণ করবে, নাকি ক্লান্ত মধ্যবিত্তের জন্য নির্মিত 'রূপকথা'র আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখবে? 'জ্বালা'-এর পুনঃপ্রচলন কেবল একজন কিংবদন্তী শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানানো নয়, বরং সমাজের প্রতি থিয়েটারের হারানো নৈতিক অঙ্গীকার পুনরুদ্ধারের এক অপরিহার্য প্রক্রিয়া। এটি মানুষের চিরন্তন বঞ্চনা ও বেঁচে থাকার আকুতির প্রতিচ্ছবি। একুশ শতকের

কলকাতায় যখন থিয়েটার চর্চা তার শিকড় খুঁজছে, তখন 'জ্বালা' পুনরায় পাঠ করা এবং মঞ্চস্থ করা অত্যন্ত জরুরি। এটি আমাদের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং প্রশ্ন তোলে— আমরা কি সত্যিই গত সাত দশকে সেই 'জ্বালা' থেকে মুক্তি পেয়েছি? সামগ্রিক বিশ্লেষণ থেকে একথা নির্ণয় করা যেতে পারে যে, থিয়েটার চর্চার প্রসঙ্গ আলোচনা দিয়ে এক নাটকের মধ্যে দিয়ে সমাজ-সংস্কৃতি-বিনোদন থেকে আরও কিছু পাওয়া যাচ্ছে। তা হল প্রাসঙ্গিকতা। অর্থাৎ, কেন এই নাটকের চর্চা এখনও চলছে। পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ জুড়ে সেই ব্যাখ্যাই রাখার চেষ্টা করা হল। যতক্ষণ সমাজে বৈষম্য থাকবে, যতক্ষণ মানুষ তার প্রাপ্য অধিকারের জন্য লড়াই করবে, ততক্ষণ কলকাতার থিয়েটারে ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এটি আগুনের মতো— যা পুড়িয়ে শুদ্ধ করে এবং নতুন সৃষ্টির পথ দেখায়।

তথ্যসূত্র:

১. https://eisamay.com/entertainment/theater-was-ritwick-ghatak-first-love-he-clung-to-theater-until-his-last-breath/200432321.cms. ব্যবহারের তারিখ ১২ জানুয়ারি ২০২৬. সময়: সকাল ১১ টা

২. https://youtu.be/jJLffmiIlk8?si=FZXKO1NFw6mBLp-q. ব্যবহারের তারিখ ১২ জানুয়ারি ২০২৬. সময়: দুপুর ১ টা

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঘটক, ঋত্বিককুমার। চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরও কিছু। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, ২০০৫।
২. ঘটক, ঋত্বিককুমার। ঋত্বিক ঘটকের গল্পসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১।
৩. চক্রবর্তী, রথীন। পিপলস্ থিয়েটার রম্যাঁ রলাঁ। নাট্যচিন্তা: কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬।
৪. চৌধুরী, দর্শন। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস। পুস্তক বিপণি: কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২৩।
৫. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল। থিয়েটার ও রাজনী।নাট্যচিন্তা: কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩।
৬. দে, সন্ধ্যা। অন্যধারার থিয়েটার: উৎস থেকে উজানে। মৌহারি: কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৪।
৭. রুদ্র, সুব্রত। সেই ঋত্বিক। প্রতিভাস: কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৫।
৮. সরকার, পবিত্র। নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা, এপ্রিল ২০২১।

সহায়ক অন্তর্জাল ঠিকানা:

১. https://share.google/tytwi6W0Ksq9NP77N . ব্যবহারের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬. সময় : সন্ধ্যা ৬ টা

২. https://share.google/frGW20nOIMeo131fE . ব্যবহারের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬. সময় : রাত্রি ১০ টা

৩. https://youtu.be/jJLffmiIlk8?si=FZXKO1NFw6mBLp-q . ব্যবহারের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬: সময় রাত্রি ১০:৩০ মিনিট